International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-III, November 2016, Page No. 9-20
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

রবীন্দ্রনাট্যের অন্তর্বয়নে সঙ্গীতের ভূমিকা: রক্তকরবী, চিত্রাঙ্গদা ও চন্ডালিকা

দেবশ্রী নন্দী
গবেষক, রবীন্দ্র সঙ্গীত বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The story, the songs and dances, the acting- in every aspect Rabindranath Tagore's dramas are incomparable and world-class. The songs, which have been used in his dramas, are highly valuable. These songs have helped the dramas to reach the higher level of popularity as well as they made the dramas easier and more understandable to communicate the central theme and to convey the main message to the audiences. The songs, those are used in the mentioned three dramas (Raktakarabi, Chitrangada and Chandalika) have helped the stories to get established and have taken them to their ultimate climaxes. The main perspective of this article is to analyze how the songs have successfully presented the development of the story and reflected the dramatic situations in these three dramas of Tagore.

Keyword: Lyrical, Mass-education, projection, creativity, art-form, compositions

রবীন্দ্র-শিল্প-সাহিত্যের যে কোন শাখা নিয়ে চর্চ্চা বা বিশ্লেষণের গোড়াতেই একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রপ্রতিভা মূলতঃ গীতধর্মী। কবির কাব্য, গান তো বটেই, এমনকি তাঁর রচিত উপন্যাস, নাটক, গল্প সব-ই লিরিক্যাল বা গীতধর্মী। রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লিখিত হয়ে থাকে এ কথা ঠিকই, কিন্তু গুরুদেবের লোকাশ্রিত নাটক বা গদ্যনাটকগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। তাছাড়া এগুলির সঙ্গীত-বহুলতা ও নাটকের নাট্যমূল্য বৃদ্ধিতে গানের প্রয়োগের চিন্তাভাবনা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গীতধর্মী-মানসকেই চিহ্নিত করে। রবীন্দ্রনাট্যে ব্যবহৃত গানগুলি কথা ও সুরের 'অর্দ্ধনারীশ্বর' রূপেরই বাহন। এ গানগুলির মধ্যে কিছু গান নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আবার কিছু স্বতন্ত্র রবীন্দ্রগান হিসেবেও গেয়। তাই একাধারে গান ও নাট্য-কাহিনী বয়নের 'দ্বৈত শাসনে' নাটকগুলি হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র, কালজয়ী এবং বাংলা থিয়েটারি আবেগের প্রভাবমুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাধনার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে যে, রবীন্দ্র শিল্পপ্রতিভার ঊষা লগ্ন থেকে জীবনের অন্তিম অধ্যায় পর্যন্ত এই সাধনার পথ বিধৃত হয়ে রয়েছে। আর এই নিরবিচ্ছিন্ন গতিপ্রবাহের যাত্রাপথে বিধৃত হয়ে আছে তাঁর আত্মসমীক্ষার ইতিহাসটুকুও। একদিকে নাটকের ক্রমোন্নতির পথ ধরে এসেছে কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, গদ্যনাট্য(রূপক-সাঙ্কেতিকধর্মী তত্ত্বগত) ও নৃত্যনাট্য পর্ব, অন্যদিকে খুব অন্তর্লীনভাবেই নাটকের উচ্চারিত হচ্ছে 'আত্মনিবেদন, প্রেমের উদ্বোধন এবং প্রাণের জাগরণ'[১]-এর মন্ত্রগুলি। মোটামুটি ভাবে বিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষদিকে রবীন্দ্রনাট্যের অভিমুখ পরিবর্তিত হয় এবং ক্রমশঃ ঋতুনাট্য এবং সঙ্কেতধর্মী নাট্যসৃষ্টির দিকে গুরুদেব মনোনিবেশ করেন। এইসব সাঙ্কেতিক তত্ত্ব-নাটকগুলিতে শিল্পের আবরণে ধর্ম, প্রেম, মানবচেতনা, সমাজচেতনা সম্পর্কে কবির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গেল। তবে রবীন্দ্রনাট্যপ্রতিভা যতই তার পরিণতির দিকে

ধাবমান হয়েছে, নাটকে গানের প্রয়োগও ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। নাটকের তত্ত্বচিন্তা বা মূল বক্তব্যকে গানের সাহায্যে পরিস্ফূট করতে চেয়েছেন গুরুদেব, করে তুলেছেন আরও হৃদয়গ্রাহী। এ প্রসঙ্গে প্রভু গুহঠাকুরতা[২] মন্তব্য করেছেনঃ

> " It is essentially the musical qualities which distinguish his dramatic genius."

আবার ধূর্জটিপ্রসাদ[৩] বলেছেনঃ

> " Tagore's musical compositions cannot but help the drama because of the very nature and nurtute of his genius."

গুরুদেবের নাটকে ব্যবহৃত গানগুলির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে তাঁর অধ্যাত্মচেতনা, তাঁর অন্তর ও মননে গানের স্বরূপ কি এবং উভয়ের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্রটিকে চিনে নেওয়া প্রয়োজন। শ্রী ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বইয়ে মন্তব্য করেছেন যেঃ

> "...স্বরূপ উপলব্ধির তন্ময়তায় কবি একসময় কেবল গানই রচনা করতে পেরেছেন... আত্মার আনন্দ-লীলার সঙ্গে গানের এই অবিচ্ছেদ্য যোগটি লক্ষ্য করলে আমরা রবীন্দ্রনাটকে সঙ্গীতের অপরিহার্যতা সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারব। আবার যখন এই অনির্বচনীয়ের প্রকাশকে নিজের রূপময় সমগ্র জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে অনুভব ক'রে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তখন সেই রূপের মধ্য দিয়ে অরূপের লীলাকে নাটক ছাড়া অন্য কোন আঙ্গিকে প্রকাশ করতে পারেন নি, কারণ ক্রিয়াকে স্বরূপে প্রকাশ করবার একমাত্র বাহন হ'ল নাটক।"

বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের ধারাকে নিজের নাটকে ধরে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাই তাঁর নাটকে গানের ব্যবহার হয়েছে বহুল পরিমাণে। তাছাড়া সুরহীন কথার তুলনায় গানের প্রতি তাঁর আস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্য সবসময় যে শুধু নাটকের প্রয়োজনেই গান রচিত হয়েছে এমনটা নয়, কখনও কখনও 'জনরুচির দায়ে' আবার কখনও অভিনয়ের সময়কে দীর্ঘতর করার উদ্দেশ্যেও গানে নাটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন কবি। তবে এ কথা সর্বৈব ভাবে সত্য যে এই গানের পথ ধরেই শ্রোতৃচিত্ত আর রবীন্দ্রমানসের সেতুবন্ধটি রচিত হয়েছে। তাঁর গান শুধু নাটকের বাহ্যিক অলঙ্কার হয়ে থেমে থাকে নি, হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাট্যের মতো শক্তিশালী ও দ্যোতনাময় শিল্পমাধ্যমের মূর্তিময়ী প্রতিমা।

গুরুদেবের নাটকগুলি চরিত্রচিত্রণ, ঘটনার পারম্পর্য রচনা, সংলাপ রচনা, পরিণতি, সৃজন - নাট্যরীতির এই চিরাচরিত পথ ধরে চললেও তার রসগ্রহণের মাত্রাকে, নাটকের রস ও রসায়নের আবেদনকে সংবেদনশীল স্তরে টেনে নিয়ে গিয়েছে তাঁর গান। 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধে গুরুদেব মন্তব্য করেছেনঃ

> "...ভাষার তো হৃদয়ের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নাই, তাহাকে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়... তাহাকে বুঝিতে অর্থ করিতে অনেকটা সময় যায়। কিন্তু সংগীত একেবারে এক ইঙ্গিতেই হৃদয়কে আলিঙ্গন করিয়া ধরে।
>
> এইজন্য কবিরা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে একটা সংগীত নিযুক্ত করিয়া দেন...ছন্দে এবং ধ্বনিতে যখন হৃদয় স্বতই বিচলিত হইয়া উঠে তখন ভাষার কার্য অনেক সহজ হইয়া আসে। ..."

নিজের নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে সব মন্তব্য করেছেন তার মধ্যে অধিকাংশই, (বিশেষতঃ তাঁর নাট্য-জয়যাত্রার প্রথমার্ধে রচিত নাটকগুলি সম্পর্কে করা কবির মন্তব্যসমূহ) চিঠিপত্র, প্রবন্ধ এবং 'জীবনস্মৃতি'র পাতা থেকে উদ্ধৃত হয়েছিল অনেক পরে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশনার সময়। ১৯২৬ সালে 'রক্তকরবী' নাটকটি প্রকাশিত হয়। নিজের নাটক সম্পর্কে এই প্রথম কবির নিজের সুদীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক মতামত পাওয়া গেল। এই নাটকটিকে নাট্যকার 'সত্যমূলক' বলে মন্তব্য করলেন। আবার আগের প্রথম যুগের নাটকগুলিকে নিজের জীবন থেকে

উৎসারিত বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য এ কথা সত্য যে, গুরুদেবের শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই তাঁর আত্মচৈতন্যের প্রকাশ। গুরুদেব স্বয়ং 'সাহিত্যের পথে'- তে বলেছেনঃ

> "...মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটা বড়ো পথ।"

সুতরাং, তাঁর নিজের যে শিল্পসৃষ্টি-প্রতিভা সতত ক্রিয়াশীল, তার প্রেরণা তাঁর নিজের চৈতন্যই যা তাঁর 'আত্মার অভ্রান্ত নিগূঢ় উৎসস্থল' থেকেই স্বতোৎসারিত। তাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার জপমালায় গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে রয়ে গিয়েছে তাঁর জীবন-সাধনার মন্ত্র-শুক্তিগুলি। এই আত্মচৈতন্য ছাড়াও আরও একটি বিষয় তাঁর শিল্পসৃষ্টি সাধনায় তাঁকে জীবনব্যাপী প্রেরণা যুগিয়েছে, সেটি তাঁর প্রকৃতিমগ্নতা । মানবচিত্ত এবং বিশ্বপ্রকৃতির মিলনেই কবিচিত্ত উদ্বোধিত হয় নব 'মানবধর্ম' মন্ত্রে। এই ধর্ম কোনো সমাজ-শাসিত ধর্ম নয়, গুরুদেবের 'নিগূঢ় চেতনা[৪]'-য় ভাস্বর এই 'প্রকৃতিনিহিত ধর্ম' বোধ। যাকে গুরুদেব 'ছিন্নপত্রাবলী'-তে স্পষ্ট করে বলেছেনঃ

> "অনাদি অনন্ত আকাশ-পূর্ণ নিত্য স্পন্দমান ঘূর্ণ্যমান অনু পরমাণুর সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আনন্দময় আত্মীয়তার বন্ধন।"

এইজন্যই প্রকৃতি তাঁর রচনাতে কোনও প্রতীক বা কেবল পটভূমিকা হয়েই থেমে থাকেনি, হয়ে উঠেছে সজীব চরিত্র। ঋতুনাট্যের যুগে প্রকৃতির বিচিত্র লীলার রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছে মানবলীলা। সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বহীন এই চির অবিচ্ছেদ্য, চিরকালের সত্য-সম্বন্ধের নাটমঞ্চে যে মানবের দেখা মেলে, সেই 'মানুষের গণ্ডিমুক্ত মানুষ'-কেই কবি বরণ করে নিয়েছেন, তার সাথে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করেছেন নিজের গান দিয়ে। আর এই পথেই কবিচিত্ত আর বিশ্বমানবচিত্তের যোগ স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে নটরাজের 'অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের প্রকাশের পালা'-য় তিনি পেয়েছেন কাজের ভার, লিখেছেনঃ

> " আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে
> এ আমার পরম বিস্ময়"... [জন্মদিনে]

রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, গদ্যনাট্য, ঋতুনাট্য এবং পুনর্লিখিত বা রূপান্তরিত নাটক মিলিয়ে প্রায় অর্ধশত সংখ্যক নাটক রচনা করেন। নাটক নিয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এ কথা বোঝা যায় যে নিজের নাটককে তিনি নৃত্য, গীত, সংলাপ, ছন্দবৈচিত্র্য, চিত্রকল্প, কাব্যগুণ, পরিবেশন, মঞ্চসজ্জা - সকল দিক থেকেই পূর্ণতম রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। নাটকের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে অন্যান্য 'Art Form'-এর সদর্থক ভূমিকা নিয়ে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না-

> " নাট্যাভিনয়ে আমাদের হৃদয় বিচলিত করিবার অনেকগুলি উপকরণ একত্রে বর্তমান থাকে। সংগীত, আলোক, দৃশ্যপট, সুন্দর সাজসজ্জা, সকলে মিলিয়া নানা দিক হইতে আমাদের চিত্তকে আঘাত করিয়া চঞ্চল করে; তাহার মধ্যে একটা অবিশ্রাম ভাবস্রোত নানা মূর্তি ধারণ করিয়া, নানা কার্যরূপে প্রবাহিত হইয়া চলে- আমাদের মনটা নাট্যপ্রবাহের মধ্যে একেবারে নিরুপায় হইয়া আত্মবিসর্জন করে এবং দ্রুতবেগে ভাসিয়া চলিয়া যায়। অভিনয়স্থলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন আর্টের মধ্যে কতটা সহযোগিতা আছে, সেখানে সংগীত সাহিত্য চিত্রবিদ্যা এবং নাট্যকলা এক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সম্মিলিত হয়, বোধ হয় এমন আর কোথাও দেখা যায় না ।" [পঞ্চভূত, গদ্য ও পদ্য]

রবীন্দ্রনাটকে গানের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কতখানি সেই আলোচনায় প্রবেশ করতে গেলে সর্বাগ্রে ঋতুনাট্যের কথাই এসে পড়ে সেটা ঠিকই, কিন্তু এই নিবন্ধে আমরা পরিক্রমণ করব তাঁর নাট্যবিবর্তনের পথটিকেও- রক্তকরবী, চিত্রাঙ্গদা আর চণ্ডালিকা- এই তিন নাটকের আলোচনায় একাধারে সম্পূর্ণ হয় গুরুদেবের সাঙ্কেতিক-গদ্যনাট্য,

কাব্যনাট্য এবং নৃত্যনাট্যের বৃত্তীয় পরিধিটি । তাছাড়া কাব্যনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য এবং গদ্যনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য রূপান্তরের পর্বটিও এই আলোচনায় যুক্ত হতে পারবে।

গুরুদেব তাঁর নাটকে 'রুদ্রের দক্ষিণ মুখ' দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাই একাধারে রক্তকরবীর মতো তত্ত্বাশ্রয়ী এবং ভারতীয় লোকনাট্য-শৈলীর আদলে রচিত ব্যঞ্জনাগর্ভ নাটক, চিত্রাঙ্গদার মতো পৌরাণিক আধারাশ্রিত নাটক আবার চণ্ডালিকার মতো বৌদ্ধ আখ্যান এবং দর্শনাশ্রিত নাটক তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। তাঁর ঐতিহ্য-অনুরাগ এবং সমাজ-সচেতনতার প্রতীক এই নাটকগুলি আদ্যাবধি বহুচর্চিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়। আবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে এই তিনটি নাটক তিন নারীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। এই তিন নায়িকা সমাজের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অবস্থান করছেন এবং তিনজনেই প্রশস্ত করেছেন সমাজের ভবিষ্যৎ উত্তরণের পথটিকেও।

রক্তকরবীঃ রক্তকরবী নাটকটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকের প্রাণপ্রতিমা নন্দিনী নামের নারীটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নাটকের মূল কাহিনী। গুরুদেব স্বয়ং 'রক্তকরবী' সম্পর্কে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'-তে মন্তব্য করেছেন :

> "নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।
> এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে ।... সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। ...
> এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর...তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

যক্ষপুরীর শ্রমিকের দল মাটির তলা থেকে সুরঙ্গ বেয়ে খোদাই করে তুলে নিয়ে আসে সোনার পিণ্ড। তাদের নেই কোনো মনুষ্য-পরিচয়। যক্ষপুরীতে তাদের অস্তিত্ব শুধুই কতকগুলি সংখ্যা আর অক্ষর হয়ে রয়ে গিয়েছে। কিশোর, ফাগুলাল, সর্দার, মোড়ল, গোঁসাই, চিকিৎসক, বিশু, চন্দ্রা সকলের ভবিষ্যৎ যক্ষপুরীর যন্ত্র-শাসনের চাপে হয়েছে বিকৃত। দূর অতীতের গাঁয়ের বটচ্ছায়াঘেরা শান্তি আর আনন্দের দিনগুলি তাদের কাছে হয়েছে স্বপ্নের মতো, বন্ধ হয়েছে ফিরে যাবার পথও। সেই 'উধাও পথের'-ই আহ্বান এসেছে নন্দিনীর হাত ধরে। সে সুরঙ্গের তরল অন্ধকারের ঢাকা সরিয়ে ঢেলে দিতে চায় আলো। 'নন্দিনীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে উপস্থাপিত করেছেন সজীব প্রকৃতির প্রতীক হিসাবে। প্রাণহীন যক্ষপুরীতে সে বহন করে এনেছে প্রাণের বার্তা'। নন্দিনীই রক্তকরবী, 'পীড়নের ভিতর দিয়েই তার আত্মপ্রকাশ'। নাটকের চূড়ান্ত পর্বে প্রেমাস্পদ রঞ্জনের মৃত্যুতে নন্দিনী রাজার সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াই-এ অবতীর্ণ হল, ছিন্ন হল রাজার লোহার জাল, ভেঙে পড়ল যক্ষপুরীর অবরুদ্ধ বন্দীশালা।

রক্তকরবী নাটকের অধিকাংশ গান গীত হয়েছে বিশুর কণ্ঠে। আর নন্দিনীর কণ্ঠে একটি মাত্র গান আমরা পাই। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক গানের ভিতর দিয়ে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এই দুই চরিত্র। হাটের চেঁচামেচির মাঝে নন্দিনীকে 'সুরে বাঁধা তম্বুরা' বলেছেন অধ্যাপক। আবার এই নন্দিনীই বিশু পাগলের গানে দিয়েছে সুর, নাচে দিয়েছে ছন্দ । বিশুর গানগুলি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উন্মোচিত করে। তার প্রেম, যন্ত্রণা, আত্মদহন সবকিছুই তার গানে ফুটে উঠেছে । যক্ষপুরীতে আসার আগে থেকেই নন্দিনী তার পরিচিত। নন্দিনীর প্রতি তার গভীর প্রেম পরিণতি লাভ করেনি। তাই নন্দিনী তার কাছে চিরদুঃখের দূরের রাঙা আলো। বিশুর প্রাণ আর গান দুই-ই নন্দিনীর

প্রতি সমর্পিত। নন্দিনী তার স্বপনতরীর নেয়ে। বাইরে থেকে নয়, বিশুর হৃদয়ের মাঝখানটিতে বসে তাকে দেখতে হয়। নাটকে বিশুর প্রবেশ হয়েছে 'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে' গানখানি দিয়ে, সে বলেছেঃ

" আমার ভাবনা তো সব মিছে,
আমার সব পড়ে থাক্ পিছে।
তোমার ঘোমটা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে ।"

আবার ব্যক্তিগতভাবে সে মানিয়ে নিতে পারে না যক্ষপুরীর এই স্বর্ণমদির নেশা- উন্মত্ত সমাজব্যবস্থাকে। প্রকৃতির দেওয়া সহজ আনন্দের জীবন-রস থেকে যক্ষপুরীর মানুষগুলি বঞ্চিত। সুরঙ্গের অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া তাদের অন্তরাত্মা যখন তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে, তখন মদের নেশা দিয়েই তারা নিজেদের ভুলিয়ে রাখে। বিশু তাদেরই একজন। চরম সাথী মৃত্যু এসে তার সকল ক্লান্তি সকল সন্তাপ হরণ করুক এই তার বাসনা-

"তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে,
তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয় যে রঙিন করে ।"

যক্ষপুরীর অতলান্ত অন্ধকারের মাঝে শুধু বিশু আর নন্দিনীর মধ্যেকার আকাশটুকুই অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে। নন্দিনী ব্যথার আড়াল থেকে বিশুর প্রাণকে সুধায় পরিপূর্ণ করেছে, সে বিশুর 'সমুদ্রের অগম পারের দূতী'। তাই তো 'দুখজাগানিয়া' নন্দিনীকে উদ্দেশ্য করেই সেই অবিস্মরণীয় কালজয়ী প্রেমের গানটি বিশু গেয়ে ওঠে-

'আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে ।
আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো
ওগো দুখজাগানিয়া !'
[তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুমভাঙানিয়া !]

'ঘুমভাঙানিয়া' নন্দিনীর স্পর্শে বিশুর জীবনতরীর বাঁধন গেছে খুলে। চেনার কূল থেকে অচেনার কূলে যাত্রা করেছে বিশুর অন্তরাত্মা । ঠিক যেমনভাবে চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার আসে তেমন করেই 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার' গানে 'বিশুর দুঃখের পারাবারে লাগে জোয়ারের ঢেউ'।

নন্দিনী নিজের পূর্ণতা দিয়ে, সহজ সুষমা দিয়ে যক্ষপুরীর জড়ত্বের মধ্যে এনে দিয়েছে প্রাণের চেতনা। প্রকৃতির প্রাণের লীলা আর সামঞ্জস্য সাধনের ক্রিয়া দুই-ই প্রকাশিত হয়েছে নন্দিনীর মধ্যে দিয়ে। 'রাজা, ফাগুলাল, অধ্যাপক সকলের উত্তরণ ঘটে নন্দিনীর হাত ধরেই। সে 'পূর্ণলোকের অধিবাসিনী' বলেই যক্ষপুরীর মানবগুলিকে

প্রাণের 'ঊর্দ্ধলোকে আকর্ষণ' করছে, আকৃষ্ট করছে অমৃতের দিকে। প্রেম, দয়া, করুণা, মমতা আর আনন্দের অংশভাগ দিয়ে যক্ষপুরীর পীড়িত মানুষগুলিকে সে উপস্থিত করেছে প্রাণের লীলাক্ষেত্রে'। তাই তো নন্দিনীর কণ্ঠেই 'ভালোবাসি,ভালোবাসি' গানে সেই অনন্ত বিশ্বপ্রেমের সুর ধ্বনিত হয়েছে, যে সুরে 'ভোলা দিনের কাঁদন হাসি' দুলে ওঠে।

রঞ্জনের আগমন সংবাদে যখন নন্দিনীর অন্তর বিচলিত হয়ে ওঠে, বিশুর কাছে সে শুনতে চায় 'পথচাওয়ার গান'। এই গান তো বিশুরও যুগ- যুগ ধরে পথ চাওয়ার গান, নন্দিনীর থেকে অল্প কিছু পাওয়ার তুলনায় কিছু না পাওয়ার মূল্য তার কাছে অনেক বেশি। নন্দিনীর এই 'কিছু-না-দেওয়া'কে ললাটে পরে চলে যেতে চায় সে । 'যুগে যুগে বুঝি আমায়' গানে বিশু বলেছে-

'আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে,
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।'

অনিবার্য ভাবেই বিশুর গানে চাঁদ আর নন্দিনী বারবার একাকার হয়ে গেছে। কারণ নন্দিনীর অমোঘ আকর্ষণে বিশুর দুঃখের পারাবারে জাগে জোয়ার।

রক্তকরবী নাটকের সপ্তম খসড়ায় বিশুপাগলের কণ্ঠে পাওয়া যায় আরও একটি গান। এই গানে বিশু নন্দিনীর মাথায় যে 'রক্তরাগের ঘোমটা' দেখতে পায়, সে রঙ শুধু রক্তকরবীর নয়, বিশুর হৃদয়-সংরাগের রংটুকুও যেন ছড়িয়ে পড়েছে এই গানে। তাই এই গানটি পাঠ করা অসঙ্গত হবে না।

'আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো ধরলি রে কে তুই।
আমার শেষ পেয়ালা চোখের জলে ভরলি রে কে তুই ।।
দূরে পশ্চিমে ওই দিনের পারে অস্তরবির পথের ধারে
রক্তরাগের ঘোমটা মাথায় পড়লি রে কে তুই।।

রক্তকরবী নাটকে প্রকৃতির বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন প্রাণহীন যক্ষপুরীর সমাজকে, সেখানে পাকা ফসল ভরা ক্ষেতের বিপরীতে অবস্থান করে যক্ষপুরীর রাজার লোহার জাল, মাটির উপরিতলের সবুজ প্রাণের লীলার বিপরীতে আছে বানানো সুড়ঙ্গের মৃত্যু-তরল অন্ধকার, নবান্নের আবাহনে ধরার উথলে ওঠা উল্লাসের বিপরীতে থাকে মাটির নীচেকার কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত। দ্বন্দ্ব আর বৈপরিত্যের এই সমাবেশ প্রতীকিত করে বিকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির চূড়ান্ত সংঘাতকে। নাটকে বারবার ঘুরেফিরে ব্যবহৃত হয়েছে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটি। এই গান আসলে নাটকের মূল প্রেক্ষাপট বা পটভূমিকা তৈরী করে দিয়েছে। 'অসীমের আহ্বান' আছে এই গানে। আছে যন্ত্রযন্ত্রনাদগ্ধ নাগরিক সভ্যতা থেকে দূরে নবান্নের উৎসবমুখর সুখী গৃহকোণের আশ্বাস। পাকা ফসলের গন্ধ, মাটির আঁচল, রোদের সোনা, মাঠের বাঁশি, আকাশের খুশি, ছুটির গান এই সব তারই দ্যোতক। প্রকৃতির হাত ধরে খণ্ডিত মানবসত্ত্বাকে অখণ্ড মনুষ্যত্বের পথে ডাক দিয়ে যায় এই গান।
অবশ্য এই জাতীয় আরও একটি গানের দুটি পঙ্‌ক্তি কবি ব্যবহার করেছেন এই নাটকের চূড়ান্ত পর্বে। এই ফসলকাটার গান দিয়ে প্রকৃতি যেন স্বয়ং নিজের মনুষ্য ধনগুলিকে ঘরে ফেরার আহ্বান জানাচ্ছেন, অভ্যর্থনা করছেন নিজ স্নেহক্রোড়চ্ছায়ায়।

'শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও বাঁধো আঁটি,
বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হোক মাটি ।'

যক্ষপুরীতেও 'মাঠের লীলা' শেষ হয়, শুরু হয় প্রাণের ক্রিয়া। অবশ্যম্ভাবী ভাবেই ধূলিস্যাৎ হয় বিকৃত শক্তির আস্ফালন। প্রকৃতির দূতী নন্দিনীর 'ধূলার আঁচল' ভরে ওঠে পাকা ফসলে।

চিত্রাঙ্গদাঃ নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গদা ১২৯৯ সালে প্রকাশিত হয়।পরে ১৩৪২ সালে নৃত্যনাট্য নামে রূপান্তরিত এবং প্রচলিত অবয়বে প্রকাশিত হয়। গুরুদেব স্বয়ং এই নাটক সম্পর্কে বলেছেনঃ

> " এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে আছে , প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
> পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
> নিরলংকার সত্যের সহজ মহিমায় ।"
> [প্রবাসী, ১৩৪২] (গ্রন্থপরিচয়)

চিত্রাঙ্গদা 'যৌবন উৎসবে'র সংগীত। কাব্যনাট্য থেকে নৃত্যনাট্যের রূপান্তর গানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুরূপা চিত্রাঙ্গদার মতোই নবকলেবরে পুনর্জন্ম হয়েছে কাব্যনাট্যটির। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের বিজ্ঞপ্তিতে গুরুদেব জানিয়েছেনঃ

> " এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই-জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে । কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়।..."

নতুনরূপে চিত্রাঙ্গদা কে সৃষ্টি করতে গিয়ে কবিকে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। প্রথমতঃ সুঠাম এবং নাটকীয় হতে গিয়ে কাব্যনাট্যটির অনেক অংশে ভাবের বিস্তার যে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে সে কথা কবি নিজে প্রতিমাদেবীকে জানিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ সুরহীন কবিতার প্রয়োগে নাট্য-আঙ্গিকে নতুনত্ব দেখা দিল। প্রতিমাদেবী তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য' প্রবন্ধে কবির অনুমোদন নিয়ে লিখেছেনঃ

> "চিত্রাঙ্গদার আর-একটি বিশেষ জিনিস হল ছোটো ছোটো কবিতাগুলি, তারা মাঝে মাঝে সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে মূল ঘটনার, গান ও নাচ বন্ধ করে দর্শকের চিত্তকে বিশ্রাম দেওয়ার সঙ্গে নাটকের ঘটনাসূত্রের যোগ রাখাই হল তাদের কাজ..."

তৃতীয়তঃ ভাবের তাৎপর্য অনুযায়ী গানের ভাষা-বিন্যাসের পরিবর্তন বা কথার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে চিত্রাঙ্গদায় ব্যবহৃত সব গানই যে নাটকের প্রয়োজনে লিখিত তা নয়, এই নৃত্যনাট্যে এবং সব নৃত্যনাট্যেই অভিনয়কে দীর্ঘতর করতে গিয়ে , কখনও সাজসজ্জার সময় দিতে গানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে চিত্রাঙ্গদায় এ জাতীয় গানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, কেননা এটিই গুরুদেবের প্রথম নৃত্যনাট্য। চতুর্থতঃ রবীন্দ্রশিল্পে নাচ গান আর অভিনয়ের ত্রিবেণীসঙ্গমস্থল এই নৃত্যনাট্যগুলি । গীতিমুখর সংলাপকে আশ্রয় করে নাচ হয়ে উঠেছে নাটকের ভাষা। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলিতে মূলতঃ নাচ হল ভাবের বাহন। এই সব নাটকের সংলাপ রচিত হয়েছে সুরে। নৃত্যকে কবি 'দেহভঙ্গির সংগীত' বলে উল্লেখ করেছেন। সেই নৃত্যের সঙ্গে যখন মিলিত হল গান আর নাটক তখন পুরাতন ঐতিহ্য নতুন দিগ্‌দর্শনের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। নাটকে গীতশৈলীর প্রয়োগের আদর্শটি গুরুদেব প্রাচীন ভারতীয় নাট্যরীতি থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু নাটকে সঙ্গীত বা নৃত্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে স্বকীয়তার সাক্ষর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন তা অবিস্মরণীয়। ভারতের প্রাচীন নাট্যশৈলীর এমন সূক্ষ অথচ গভীর পরিণতি শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের সূচনা হয়েছে 'মোহিনী মায়া এল' গানটি দিয়ে। এই গানে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যের প্রেক্ষাপট রচনা করে দিয়েছেন। 'মায়ার খেলা'-তে যেমন মায়াকুমারীগণ জলে স্থলে মায়া গেঁথে ভূবনে 'প্রেমের ফাঁদ' পেতেছেন এখানেও সেই 'যৌবনকুঞ্জবনে হৃদয়শিকারে'-র ইন্দ্রজাল বোনা হল।

চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের সূচনায় অনঙ্গ আশ্রমে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের কাছে প্রত্যাখ্যত হওয়ার যে অতীত-কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন নৃত্যনাট্যে সেই ঘটনাকে গুরুদেব উপস্থাপিত করেছেন মঞ্চে। কাব্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের

প্রথম সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে পরিচয় পর্ব, চিত্রাঙ্গদার বেশবাস পরিবর্তন ও অরণ্যের শিবালয়ে গমন করে প্রেম নিবেদন, অর্জুনের প্রত্যাখ্যান এবং মদনের কাছে বর প্রার্থনা পর্যন্ত যে দীর্ঘ কাব্যাংশ আছে নৃত্যনাট্যে সেই মূল ঘটনাটিকে অপরিবর্তিত রেখেছেন কবি। কিন্তু কাব্যাংশগুলি গানে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন-

চিত্রাঙ্গদার আত্ম-উদ্দীপনার গান 'ওরে ঝড় নেমে আয়', চিত্রাঙ্গদার নারীপ্রকৃতির নব-উন্মেষ পর্বে 'বঁধু কোন্ আলো লাগল চোখে', চিত্রার স্নানযাত্রাকালে 'শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে' গানে হৃদয়ে অতল জলের আহ্বান শ্রবণ, 'দে তোরা আমায়' গানে সাজসজ্জা, অর্জুনের সন্দর্শনাভিলাষে গমন এবং 'আমি তোমারে করিব নিবেদন' গায়ন, আবার প্রত্যাখ্যাতা হয়ে 'রোদন ভরা এ বসন্ত' এবং চিত্রাঙ্গদার মদনকে পূজা নিবেদনের গান 'আমার এই রিক্ত ডালি' ইত্যাদি। অন্যদিকে কাব্যনাট্যের চিত্রা নারী-জাগরণের প্রতীক। তিনি মদনের আশ্বাস শুনে বলেছেন-

"সময় থাকিত যদি, একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা...
করো মোরে অপূর্ব সুন্দরী। দাও মোরে
সেই একদিন - তার পরে চিরদিন
রহিল আমার হাতে..."

কিন্তু নৃত্যনাট্যে মদন চিত্রাঙ্গদার আগমনের কারণ শুনে তাঁকে আশ্বস্ত করেন এবং বরপ্রদান করেন । চিত্রাঙ্গদা বরলাভের পরেই নিজের রূপে বিস্মিত ও যুগপৎ ব্যথিত। 'আমার অঙ্গে অঙ্গে' এবং স্বপ্নমদির নেশায় মেশা' গানে সেই মনোভাব পরিস্ফূট হয়েছে। অর্জুনের প্রণয়-সম্ভাষণকে ঘিরে 'কোন্ ছলনা এ যে নিয়েছে আকার' গানে চিত্রার কণ্ঠে যেমন লজ্জা আর ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে কাব্যনাট্যে কিন্তু কেবল তা নয়, সেখানে চিত্রাঙ্গদার ব্যক্তিত্ব সাপেক্ষে তার বক্তব্যও তদনুরূপঃ

"ধিক্, পার্থ, ধিক্ !...
... কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা? কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা..."

কাব্যনাট্যের চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের মিলন দৃশ্য বা প্রেমের কামোন্মাদনা নৃত্যনাট্যে সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে । নৃত্যনাট্যে চিত্রার অসম্মতি এবং প্রস্থান , অর্জুনের 'এ কী তৃষ্ণা, এ কী দাহ' সুরহীন পাঠ এবং প্রেমোন্মত্ততার গান 'অশান্তি আজ হানল' ইত্যাদিতে সেই দৃশ্য অনেকটা প্রশমিত রূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া চিত্রাঙ্গদার 'ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশন' এবং মদনের 'না, না, না, সখী' গানগুলির পর চিত্রা ও অর্জুনের দ্বৈতকণ্ঠে 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা' মিলনাত্মক গানটি রয়েছে। কিন্তু তাদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই অর্জুনের বাসনা-ক্লান্তি এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথোপকথোনের দৃশ্য এসে পড়ে।

কাব্যনাট্যের চিত্রা অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয়েও বেদনাকাতরা। তিনি মদনকে অনুরোধ করেন প্রদত্ত বর ফিরিয়ে নিতে, কারণ তিনি মনে করেন 'এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি শতগুনে'। এই অংশটি নৃত্যনাট্যে অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া কাব্যনাট্যে মদন, চিত্রাঙ্গদা, অর্জুন এবং মদন ও বসন্তের পারস্পরিক দীর্ঘ কথোপকথোনের শেষে অর্জুন ও বনচরগণের দৃশ্যটি বর্ণিত হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নৃত্যনাট্যে

রূপান্তরকালে কবি অনেক কাব্যাংশের ভাষা-বিন্যাস করেছেন, এই দৃশ্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যেমন- 'হো এল এল এল রে' গানটি পূর্বে এরূপ ছিল -

"বনচরঃ উত্তর-পর্বত হতে আসিছে ছুটিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্বত্য বন্যার
মতো বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।"

অথবা চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠেঃ '...এমন বঙ্কিম ভুরু/নাই তার - এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা' পরে হয়েছে 'হেন বঙ্কিম ভুরুযুগ নাহি তার, / হেন উজ্জ্বল কজ্জল আঁখিতারা ।" কিংবা অর্জুনের ভাষ্য- '...ফিরিছেন/ মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী, / বীর্যসিংহ'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া' হয়েছে 'শুনি সিংহাসনা যেন সে/ সিংহবাহিনী' ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রকৃতই সুসংবদ্ধ এবং সুঠাম বিন্যাসে বিন্যস্ত হল কাব্যের ভাব-বিস্তার। নৃত্যনাট্যে এই অংশটুকুর মধ্যেই আবার সংযোজিত হয়েছে 'সন্ত্রাসের বিহ্বলতা' গানটি।

কাব্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদা নারীর সম্মানের সপক্ষে যে কথা অর্জুনকে বলেছেন নৃত্যনাট্যে সেই কথাগুলি 'নারীর ললিত লোভন লীলায়' গানে ও 'রমণীর মন ভোলাবার' পাঠ্যাংশে সখীদের মুখে বসিয়েছেন গুরুদেব। তাছাড়া চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে 'লহো লহো ফিরে লহো' এবং মদনদেবের 'তাই হোক তবে তাই হোক' গানগুলির সঙ্গে কাব্যনাট্যের ভাবগত মিল থাকলেও দৃশ্য-রূপায়নে প্রভেদ আছে। শেষ দৃশ্যে সখীদের কণ্ঠে 'এসো এসো পুরুষোত্তম', চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে 'আমি চিত্রাঙ্গদা' এবং 'তৃষ্ণার শান্তি' গানে সমবেতনৃত্য দিয়ে নৃত্যনাট্য সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু কাব্যনাট্যে সখীদের কোনো ভূমিকা নেই। অর্জুনকে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে চিত্রাঙ্গদা বলেছেনঃ

'... প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি ; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
... ...
আমি চিত্রাঙ্গদা ।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী ।..."

এই ভাষ্যই রূপান্তরিত হয়েছে 'আমি চিত্রাঙ্গদা' গানে। এ গানে কাব্যনাট্যের মতো চিত্রাঙ্গদা-অর্জুনের সন্তান-সম্ভাবনার কথা উল্লেখিত হয়নি। বিপরীতে কাব্যনাট্যের তুলনায় গানে 'নহি' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি করে গুরুদেব গানের তথা সমগ্র নাটকের মর্মভাষ্যকে প্রথিত করেছেন দর্শক এবং পাঠকের অন্তরের অন্তঃস্থলে।

চণ্ডালিকাঃ চিত্রাঙ্গদায় ভাষা এবং সুরের বিন্যাসের উপর গুরুদেব যে পরীক্ষানিরীক্ষা গুলি করেছিলেন চণ্ডালিকায় তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে। শুধু তাই নয়, যেহেতু এই নৃত্যনাট্য পুরোটাই কথ্যরীতির উপর সুর সংযোজিত তাই এই নাটিকা গদ্যনাট্য থেকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যচর্চা-জগতে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল। কারণ কাব্য নয় সরাসরি গদ্যে সুর সংযোজনার কবির এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে অভিনব এবং অভূতপূর্ব।
চণ্ডালিকা নাটকের আখ্যান অংশটি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* –এ প্রকাশিত বৌদ্ধজাতক কাহিনী 'শার্দুলকর্ণাবদান'-এর বর্ণনা থেকে গৃহীত। ১৩৪০ সালে গদ্যাকারে এবং ১৩৪৪ সালে নৃত্যনাট্য আকারে এই নাটিকা প্রকাশিত হয়। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'জলপাত্র' কবিতায় চণ্ডালিকার পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা যায়। নাটকের মূল কাহিনীটি চণ্ডালিনী প্রকৃতির বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দকে জলদান এবং আনন্দের প্রতি প্রকৃতির আসক্তিবশতঃ তার নিজের মা-এর মন্ত্রশক্তির বাঁধনে বেঁধে আনন্দকে আনয়ন এবং শেষে ক্ষমাপ্রার্থনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে জয় করে একটি নারীর মানসিক উত্তরণের পালা উদ্ঘাটিত হয়েছে এই নাটকে। আবার কবি যেন সমাজের প্রান্তিক জনজাতি ও অন্ত্যজদের প্রতি সহমর্মিতা থেকেই

একাধারে 'সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ে'র উদ্দেশ্যে 'গণশিক্ষা'র আয়োজন করেছেন চণ্ডালিকাতে। লক্ষণীয়, একই বছরে [১৩৪০] 'মানুষের ধর্ম' প্রকাশিত হয়।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা মূলতঃ সংলাপধর্মী। ছন্দের বিধিবদ্ধ বাঁধনমুক্ত। স্বতন্ত্র গানের সংখ্যা বা 'বাহুল্য নাচগান' এই নৃত্যনাট্যকে অযথা ভারাক্রান্ত করেনি। গদ্যনাটকে ব্যবহৃত অল্প কয়েকটি গান নৃত্যনাট্যে রক্ষিত হয়েছে। যেহেতু মূল নাটক রচনার মাত্র চার বছরের মধ্যেই রূপান্তরিত নাটকটির সৃষ্টি হয়, তাই নাটকের মূল বক্তব্য এবং ভাষা-শৈলীর খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি। এই নাটকের সংলাপ বিন্যাস মেদহীন আর সংলাপের ভাবানুযায়ী সুর এবং ছন্দ ব্যবহার করেছেন কবিগুরু। নাট্য-চরিত্রগুলির মনের ভাবকে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে, নাট্যসংলাপ রচনায় কথ্যভাষা এবং লৌকিক সুরের ব্যবহার করেছেন কবি। আবার গানে তালের ব্যবহারও কথার ছন্দানুগ। সুরের গতিময় সচলতা ও ওঠানামায়, ভাষার প্রাঞ্জলতায়, ছন্দের সাযুজ্যে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য বিশেষরূপে মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

গদ্যনাট্য চণ্ডালিকায় গানের সংখ্যা পনেরটি, এগুলি স্বতন্ত্র গান । গদ্যনাট্যের যে সব গান নৃত্যনাট্যে আছে সেগুলি হল- 'যে আমারে দিয়েছে ডাক', 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা', 'ফুল বলে ধন্য আমি', 'আমায় দোষী করো' 'যায় যদি যাক' এবং 'দঃখ দিয়ে মেটাব'। তবে সবগুলি গান গদ্যনাট্যে এবং নৃত্যনাট্যে একই পরিস্থিতিতে গীত হয়েছে তা নয়। তাছাড়া ফুলওয়ালি, চুড়িওয়ালা ও রাজবাড়ির অনুচরের আগমন দৃশ্যটি নৃত্যনাট্যে নতুন সংযোজিত হয়েছে। অপরপক্ষে গদ্যনাটকের একদম শেষে আনন্দের কাছে চণ্ডালিকার মা-এর ক্ষমাপ্রার্থনা ও মৃত্যুর দৃশ্যটি নৃত্যনাট্যে বর্জিত হয়েছে। গদ্যনাট্য এবং নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার গানগুলি বিশ্লেষণ করলে সম্পূর্ণ নাটকটির কাহিনী এবং গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরগুলি একাধারে পাঠ করা সম্ভব।

চণ্ডালিকা গদ্যনাট্যের শুরুর দিকে 'যে আমারে দিয়েছে ডাক' এবং 'বলে জল দাও' গানে প্রকৃতি তার মা-কে সন্ন্যাসী আনন্দের সঙ্গে তার নিজের কথোপকথন, জলদান ও তার পূর্বাপর ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে । তার অন্তরের রিক্ততা এবং সমাজ-নির্দিষ্ট শুচিতার গণ্ডীকে অসহায় ভাবে মেনে নেওয়া ফুটে উঠেছে 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা', 'ফুল বলে ধন্য আমি' গানে। 'ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে', 'না না ডাকব না', 'আমি তারেই জানি' ইত্যাদি গান গীত হয়েছে আনন্দকে উপলক্ষ্য করে। 'আমায় দোষী করো' গানে সমস্ত ভয় এবং অপরাধ বোধকে জয় করেছে প্রকৃতি। আনন্দকে মা-এর মন্ত্রে টেনে আনতে চায় সে। 'যায় যদি যাক', 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু', 'দুঃখ দিয়ে মেটাব', 'হে মহাদুঃখ' গানগুলিতে প্রকৃতির আবেগ এবং আকুতি পরিস্ফুট হয়েছে। 'আমি তোমারি মাটির কন্যা', 'মম রুদ্ধ মুকুলদলে' গানদুটি ব্যবহার হয়েছে আহ্বানমন্ত্র উচ্চারণলগ্নে। আবার শেষমুহূর্তে প্রকৃতির মনে প্রেমের পরিণতি সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে 'পথের শেষ কোথায়' গানে। নাটকটি শেষ হয়েছে আনন্দের কাছে মা-এর ক্ষমাপ্রার্থনা ও মৃত্যুর পর আনন্দের কণ্ঠে বুদ্ধের প্রণাম-মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যের মতোই গদ্যনাটকের বর্ণনা দৃশ্যটি নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় মঞ্চে সরাসরি উপস্থাপিত হয়। নৃত্যনাট্যে ফুলওয়ালি, দইওয়ালা, চুড়িওয়ালার দৃশ্যে যথাক্রমে 'নব বসন্তের দানের ডালি', দই চাই গো, ওগো তোমরা যত এবং 'ওকে ছুঁয়ো না' ইত্যাদি গানে প্রকৃতির প্রতি সমাজের অসীম ঘৃণার চিত্র ফুটে ওঠে। প্রকৃতির মর্মবেদনা ও মা-এর সঙ্গে তার কথোপকথন ধরা পড়েছে 'যে আমারে পাঠাল', 'কী যে করিস তুই', 'কাজ নেই কাজ নেই মা', 'থাক্ তবে থাক্ তুই পড়ে' গানে । এরপরেই 'জল দাও আমায়' গানে আনন্দের প্রবেশ এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংলাপ গানের সুরে উপস্থাপিত হয়েছে। 'শুধু একটি গণ্ডূষ জল' গানে চণ্ডালিকার মানসিক মুক্তির চিত্রটি সুন্দর অঙ্কিত হয়েছে। এই দৃশ্যে যুক্ত হয়েছে 'মাটি তোদের ডাক দিয়েছে'-এই ফসল কাটার গানটি। নৃত্যনাট্যের দ্বিতীয় দৃশ্যে বৌদ্ধনারীদের কণ্ঠে 'স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল' গানটির পরেই প্রকৃতির মুখে রয়েছে 'ফুল বলে ধন্য আমি' গানটি। গদ্যনাট্যে এই গানের পূর্বেই মা প্রকৃতিকে তার অশুচিতা সম্পর্কে সাবধান করে বলেছে 'এই জায়গাটুকুর বাইরে সর্বত্রই তোর অপরাধ'। সুতরাং প্রকৃতির অন্তরের হতাশা আর আর্তি ঝরে পড়েছে এই গানে ।

কিন্তু নৃত্যনাট্যে বৌদ্ধনারীদের বন্দনাগানে বুদ্ধের চরণে গন্ধপুষ্প নিবেদনের পঙ্‌ক্তির পরে পরেই এই গানের ব্যবহার যেন সূচিত করেছে 'দেবতা'র চরণে প্রকৃতির সেই সেবা, সেই আত্মনিবেদনের ভাষ্যটিকেই। গোটা নাটকের প্রেক্ষাপট যেন এই গানেই ধরা পড়েছে। আবার 'যে আমারে দিয়েছে ডাক' গানে 'অপমান নাগিণীর খুলে যায় পাক' পঙ্‌ক্তি নৃত্যনাট্যের গানটিকে গদ্যনাট্যের তুলনায় ভিন্নমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। প্রকৃতি ও তার মা-এর কথোপকথন বিশেষতঃ 'এ নতুন জন্ম আমার', 'বাছা মন্ত্র করেছে কে তোকে', 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' গানগুলির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে নাটকের কাহিনী। এখানেই সংযোজিত হয়েছে অনুচরের দৃশ্যটি এবং রাণীমার পোষা পাখি মন্ত্র পড়ে ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গ থেকেই প্রকৃতির মা-এর মন্ত্রশক্তিকে ব্যবহার করে আনন্দকে টেনে আনবার কথা মনে পড়েছে- এ ঘটনাটিও নৃত্যনাট্যেই নতুন ব্যবহার করেছেন কবিগুরু। তবে মন্ত্র পড়ে আনন্দকে আকর্ষণ করে আনবার কথা শুনে মা কর্তৃক প্রকৃতিকে ভর্ৎসনা এবং শেষ পর্যন্ত 'বুক চেরা ধন' প্রকৃতির কথায় সম্মত হতে হয়েছে মাকে, এ ঘটনা গদ্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য উভয়ক্ষেত্রেই আছে। এই দৃশ্যের শেষদিকে 'আমায় দোষী করো', 'মা ওই যে তিনি চলেছেন' ইত্যাদি গানগুলি ছাড়াও রয়েছে 'যায় যদি যাক' গানটি। গদ্যনাট্যে এবং নৃত্যনাট্যে ভিন্ন দুই পরিস্থিতিতে েই গানটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। গদ্যনাট্যে আনন্দ 'যেখানেই যাক ফেরাতেই হবে' এই চেতনা থেকেই প্রকৃতি গানটি গেয়েছে। কিন্তু নৃত্যনাট্যে এই গানে প্রকৃতির মা মায়ার শিষ্যাদলের আগমন এবং নৃত্য উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় এবং শেষদৃশ্যে যথাক্রমে 'ওই দেখ্ পশ্চিমে মেঘ ঘনালো', 'আমি দেখব না', 'সেই ভালো মা', 'না না না পড়্ মন্ত্র তুই', 'দুঃখ দিয়ে মেটাব' ইত্যাদি গানে বর্ণিত হয়েছে প্রকৃতি ও তার মা-এর কথোপকথনগুলি। আবার 'জাগে নি এখনো জাগে নি' এবং 'ঘুমের ঘন গহন হতে' গানদুটিতে মায়ার নাগপাশ-বন্ধনমন্ত্র উচ্চারণ এবং যোগিনীদের আহ্বাননৃত্য দেখানো হয়েছে। নাটকের চূড়ান্তপর্বে 'ওমা, ওমা, ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র' গানে অবমানিত আনন্দকে মন্ত্র-বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে প্রকৃতি তার মা-কে মন্ত্র ফিরিয়ে নিতে বলে এবং 'প্রভু এসেছ উদ্ধারিতে আমায়' গানে আনন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আনন্দ এবং সকলের বুদ্ধপ্রণাম মন্ত্র দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের ক্ষুদ্রায়তন সংলাপমূলক গানগুলির জন্য এর নাটকীয় আবেদন অনেক বেশী। 'কেন দিব ফুল', 'পুজিব না', 'কাজ নেই, কাজ নেই', 'ত্বরা কর্, ত্বরা কর্, ত্বরা কর্', 'সে যে মিথ্যা', 'কিছুই থাকবে না' 'বেঁধে আনল আনল আনল', 'ওমা ওমা ওমা ফিরিয়ে নে', কথার পুনরাবৃত্তি সংলাপগুলিকে আন্তরিক অথচ গভীরভাবে প্রথিত করে দর্শকের মনে। সুরগত দিক থেকেও এই নাটকটি বৈচিত্র্যময়। যেমন- আনন্দের প্রার্থনা শুনে অশুচি প্রকৃতির গলায় তার সপ্তকে বাঁধা 'ক্ষমা করো প্রভু' গানে লেগেছে আর্তনাদের সুর, আনন্দের কণ্ঠে জলপ্রার্থনার সুরটিও সেই ভৈরবীর সুরেই মন্দ্রসপ্তকে বাঁধা, কিন্তু নাট্যচরিত্রের মানসিক অবস্থার ব্যবধানে একই রাগিণীর স্বর চলাচলের এই পার্থক্য রবীন্দ্রপ্রতিভার এক অনন্য দান। আবার মায়া ও তার শিষ্যাদের গান 'জাগেনি, এখনো জাগেনি' -এর সুরে আরোহণাভিমুখি স্বরসমূহের ব্যবহার কিংবা 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' গানের 'অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে' পঙক্তিতে উড়ে শব্দটিতে সুরের সার্থক প্রয়োগ, 'এ নতুন জন্ম আমার' গানের উদ্দীপনাকে সুরের মধ্যমে প্রকাশ অথবা 'দই চাই গো দই চাই', 'সাত দেশেতে ঘুরে ঘুরে', 'শুধু একটি গণ্ডূষ জল' গানগুলিতে চরিত্রের ভাবানুসারে কীর্তন এবং বাউল সুরের প্রয়োগ গানের কথাকে সার্থকভাবে পরিস্ফুট করেছে আর তাই গান নাচ আর অভিনয়ের ত্রিবেণী সঙ্গমে চণ্ডালিকা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের একটি সার্থক নাট্যসৃষ্টি।

তথ্যসূত্র:

১। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথের আত্মরূপ ও রবীন্দ্রনাট্যে বিবর্তন'
২। অশ্রুকুমার সিকদার, 'রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য'
৩। ঐ
৪। শঙ্খ ঘোষ, 'দামিনীর গান'

গ্রন্থসূত্র:

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্ররচনাবলী' ৩য়, ১৫শ, ১৯ শ, ২৩শ, ২৫শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৩-১৪০১ বঙ্গাব্দ
২। অশ্রুকুমার সিকদার, 'রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য', ১ম আনন্দ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯৩
৩। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথের আত্মরূপ ও রবীন্দ্রনাট্যে বিবর্তন', বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ
৪। সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদক), 'বাহা', বীণাপাণি এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৮, কলকাতা, ২০১৫
৫। সুখেন্দু দাস,(সম্পাদক),'পশ্চিমবঙ্গ', রবীন্দ্রসংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪
৬। সুজিত কুমার বসু ও অন্যান্য (সম্পাদক) 'রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০০৩
৭। শঙ্খ ঘোষ, 'দামিনীর গান', ২য় সংস্করণ, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৪০৯